শিক্ষাঙ্গনকে ওরা মুক্তবুদ্ধির বধ্যভূমি করতে চায়

সন্তোষগুপ্ত

সম্প্রতি আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্র-শিবির এবং ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ১৫ জন আহত ছাত্র হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে- এ খবর আমাকে ব্যথিত করেছে। তারপর আর একটি খবর চোখে পড়ল, হাসপাতালে নিরাপত্তার অভাবে ছাত্র শিবিরের আহত দু'জন ছাত্রকে ইবনে-সিনা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। আরও একটি খবর আছে মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে একজন তার বন্ধুকে নিয়ে ছোটভাই-এর ওখানে উঠেছে। দু'জনেই ছাত্রদলের সদস্য। ছোট ভাইটি ছাত্রশিবির করে। মেডিকেল কলেজের জরুরী বিভাগের দরোজা দিয়ে বেরোবার সময় তিনজনকেই ছাত্র শিবিরের কর্মী মনে করে ছাত্রদল হামলা করলে তারা আহত হয়।

ভেবেছিলাম এনিয়ে লিখব। না এনিয়ে এ সপ্তাহে লিখব না। কারণ সমগ্র ঘটনাগুলো (এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ হাঙ্গামার বিস্তার) নিয়ে লেখার মত মানসিকতা নেই।

হাসপাতালে যখন কেউ আহত হয়ে যায়, তাকে রুগী হিসাবেই দেখাটা স্বাভাবিক। ডাক্তারগণ সেই কর্তব্য পালন করতে সাহস পান না, কারণ বাইরের দলবদ্ধ হামলাকে তারা হিপোক্রিটাসের দশ অনুশাসন দিয়ে ঠেকাবেন, এমন বান্দা আমরা নই।

কলকাতায় ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময় দাঙ্গাকারীদের মধ্যে এরকম মানসিকতা দেখা গেলেও হাসপাতালে এ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়নি। কিন্তু দাঙ্গাকারীরা গুজব রটিয়েছে নানা রকম। প্রথমতঃ কোন্ সম্প্রদায়ের লোক হতাহত হয়েছে বেশী। যে যার সম্প্রদায়ের লোক বেশী হতাহত হয়েছে, এটাই দাবী করতো তখন। দাঙ্গার চরিত্রই এই। যুদ্ধের চরিত্র ভিন্নরূপ। সেখানে নিজের ক্ষতি গোপন করে শত্রুপক্ষের ক্ষতি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়। শত্রুর মনোবলে চিড় ধরানোর জন্য প্রচার এমনভাবে চালানো হয় যে, শত্রুরা আক্রমণের মুখে তিষ্টাতে পারছে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পশ্চাদপসরণ করার কথাটা ঘুরিয়ে বলা হতো রিগ্রুপিং, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কারণে নতুন অবস্থান গ্রহণ ইত্যাদি। দাঙ্গা থেকে বর্ণনার এই বিপরীত ধারার কারণ স্পষ্ট। যুদ্ধে দুপক্ষই নিজের ভূমিকাকে মহৎ করে দেখে। আর দাঙ্গা যে কাপুরুষোচিত এবং বর্বরতা তা দু'পক্ষই জানে। কাজেই মারামারির দোষটা পরস্পরের ঘাড়ে চাপাতে চায়। যাক সে কথা, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তান বিরোধী, কাফের ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে যারা অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করেছিল। যুদ্ধ বন্দী হিসাবে গণ্য করেনি। এবার দেখা গেল ঠিক একই ধরনের মনোবৃত্তি। তার কারণ ছাত্র-শিবির তার পূর্বতন সংগঠন ছাত্রসংঘের ভূমিকা থেকে সরে আসেনি। তারই পাল্টা হিসাবে দেখা গেল ছাত্রদল এক সময় তাদের অঘোষিত সহযোগী সত্ত্বেও, তাদের হামলার শিকার হয়েছে। ফলে সংঘর্ষে আহত হওয়ার পর হাসপাতালকেও রণাঙ্গনে পরিণত করতে তাদের বাধেনি। অন্যায়টা একতরফা এমন বলব না। কিন্তু যে অমানবিক পথ ছাত্র শিবির অনুসরণ করছে, তা অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে। না হলে হামলার সময় পায়ের শিরা কেটে দেয়ার প্রচেষ্টা কেন। হামলা করে কোথাও প্রতিপক্ষের হাত কেটেছে, চোখ উপরে নিয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া শুভ হয় নি। আমরা মানবতাবোধকে নির্বাসনে পাঠিয়েছি। এসবনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ভেবেছিলাম।

কিন্তু আমি বিষয়টি একটু ছুঁয়ে গেলাম। এর অপর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি ফেরানোর জন্য। তা হল এদেশে রাজনীতিতে ধর্মকে এমন অপব্যবহারের সুযোগ কীভাবে সৃষ্টি হল। একটা সরল ব্যাখ্যা আছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতি। এই ঐতিহাসিক সত্য উপেক্ষা করার উপায় নেই। কারণ ইংরেজরাই সে কথা বলে গেছে। বঙ্গভঙ্গের সময় বাঙ্গলার গভর্ণর বা ছোটলাট হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, দু'জনেই সুন্দরী রাণী তুল্য। তবে কখনও একজনকে [illegible] করতে হবে, কখনো তাকে। আর [illegible]দের ত্রুটি ছিল সে সুযোগটা আমরা [illegible] বৈষম্য দিয়ে, ধর্মীয় [illegible] দিয়ে সমাজে জাতপাতের বিচার দিয়ে হিন্দুদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন, তেমন অপর সম্প্রদায়ের প্রতি একই ধরনের ঘৃণার বিদ্বেষের ব্যবধান রচনা করেছিল। সুতরাং স্বসমাজে ধর্মীয় রাজনীতির কারণে যে পোষ-মানা-স্বভাবের অভিব্যক্তি তেমন অঘটন ঘটায়নি। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রে সেই একই ধরনের বিশ্বাসের সাদৃশ্য না থাকায় তা সহ্যের পক্ষে কোন যুক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

পারস্পরিক এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা উপরের দিকে যেমন তীব্র ছিল, নীচের দিকে তেমন ছিল না। কারণ তাদের খেটে খাওয়া জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিলাসী মনোভাব ছিল না। ছিল সরল ধর্মীয় বিশ্বাস। নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্য দায়ী করত নিজের কর্মফলকে। ওয়াহাবী ও ফরায়জী আন্দোলনের নেতারা একধরনের ধর্মীয় সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে মনে করতেন যে, ধর্মের পথ থেকে সরে আসার ফলেই ফিরিঙ্গী শাসন কায়েম হয়েছে। তাই ধর্মীয় সারল্য ও সাম্য এবং ভালবাসার ভিত্তির উপর সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্নে তারা ইংরেজ বিরোধী ভূমিকা নিয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিতরা রাজনীতি ও সামাজিক স্তর বিন্যাস সম্পর্কে এবং আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যার গুরুত্ব এবং শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই এদেশে মধ্যযুগের অবসানের লগ্নে ধর্মাশ্রয়ী আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনে সাড়া জাগালেও সফল হতে পারেনি। সংগঠন শক্তি, নেতৃত্ব এবং অস্ত্রশক্তির অভাবে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। বৃটিশ শাসনের সহযোগী নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন মুক্তবুদ্ধির চর্চা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছিল। শাসক শ্রেণীর সহযোগিতা সেখানে তারা করেছে। যদিও বাইরের দিকটা এরকমই মনে হয়েছিল। অথচ পার্থক্য ছিল বিরাট। বৃটিশ শাসকদের চোখ এড়ায়নি। তাই তারা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেন্থাম মিল পড়তে কিংবা ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী পড়ানোরবিরোধিতাকরেছে।

এই অবস্থার মধ্য দিয়ে জাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আত্ম সচেতন হয়ে উঠল। এই সচেতনতার স্তরে সম্প্রদায় ভেদে তারতম্য দেখা দেয়। কারণ মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তার জগতে প্রবেশের লগ্নে এর পার্থিব প্রয়োজন অর্থাৎ চাকরি, আইন ব্যবসা, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেবিত্ত শ্রেণীর মুখামুখি হল। সবক্ষেত্রেই এ সংঘাত সচেতন কোন মানসিকতা জাত ছিল এমন নয়। কিন্তু বাস্তবে এই প্রতিযোগিতা স্বাভাবিকভাবেইএসেছে।

সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসে আত্মজাগরণের মুহূর্তে ঐতিহ্যের সন্ধানে প্রাচীন ভারত (এ দেশে মুসলিম আগমন পূর্বকাল পর্যন্ত) আবিষ্কারে ধর্মীয় আবেগ প্রবল হয়ে দেখা দিল। স্বাভাবিকভাবেই তা এদেশবাসী মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে তা দাগ কাটতে পারেনি। ঐতিহ্য ইতিহাসের সাধারণ দলিল। তাকে কালচিহ্নিত করে ভাগাভাগি করা যায় না। এই সহজ চিন্তা তৎকালে অনেকেই মনে ঠাঁই দেননি। সম্ভবতঃ একেই আমরা ভারতীয় কূপমন্ডুকতা বলে আখ্যায়িত করতে পারি। ঠিক এমনটি ইন্দোনেশিয়াতে দেখা যায়নি। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম সেখানে স্থান করে নিয়েছিল। তারপর আরব বণিকদের বাণিজ্য এবং তৎসঙ্গে পীরদরবেশদের আগমনে ভারতের মত সেখানেও ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। আজ সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলিম। ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় প্রাচীন ভারতাগত ও ইসলামী ঐহিত্য এক স্রোতে মিশে গেছে। গরুড় বিমান কোম্পানী ভারতীয় মিথিক্যাল পাখি থেকে নেয়া। যেমন পদ্ম ও স্ফিংকস মিসরীয় প্রাচীন প্রতীক। ভারতের সব ঐতিহ্য-ভারতীয় হওয়ার আগে হিন্দু ঐতিহ্যে পরিণত হওয়ায় বৃটিশ শাসনকালে ক্রমান্বয়ে পরিচয় ভাষাগত, ভৌগলিক জাত না হয়ে ধর্মীয় পরিচয় প্রাধান্য পায়। এ কারণে ঐতিহ্যগত এক ধরনের কৃত্রিম সংঘাত ভারতীয় সমাজ জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে।

এ সম্পর্কে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের মধ্যে সচেতনতা এসেছে প্রয়োজনের তাগিদে-- ইতিহাস চেতনা মুখ্য হয়ে সেয়া দেয়নি। একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেছেন। সেখানে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তার অহিংসা আন্দোলন আলোড়ন তুলেছে। আত্মিক বলকে রাজনীতিতে প্রয়োগের এই অভিনব পরীক্ষা তিনি ভারতের মাটিতে শুরু করার মনস্থ করলেন। তখনও তিনি মহাত্মাজী হিসাবে খ্যাত হননি। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি গঠন করা চলছে তখন। বিশের দশকের কথা বলছি। বোম্বাইতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপর বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস গঠনের দায়িত্ব দেয়া হল, তিনি দাদা ভাই নওরোজীর সঙ্গে রাজনীতি করেছেন। বৃটিশ কনস্টিটিশনাল রাজনীতিতে দল এবং কর্মঠ যোগ্য ব্যক্তি। যথেষ্ট খ্যাতি আছে তার।

স্বাভাবিকভাবেই বোম্বাই কংগ্রেস গঠনের ক্ষেত্রে তিনি কুশলতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি তখনও। কিন্তু গান্ধীজীর খ্যাতি তার কানে পৌঁছেছে। সেই গান্ধীজী আসছেন বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির কাজকর্ম দেখতে। খুবই খুশী হলেন তিনি। আর সেই খুশী ব্যক্ত করতে যেয়ে তিনি বলে বসলেন," আমি ভাবতে পারিনি একজন মুসলমান এমন দক্ষতার সঙ্গে কংগ্রেস কমিটি গড়ে তুলতে পারে। জিন্নাহকে ভারতীয় হিসেবে মর্যাদা না দিয়ে মুসলিম পরিচয়ে মুখ্য করে তোলায় নিশ্চয়ই জিন্নাহকে মর্যাদা দেয়নি। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জিন্নাহ মনে আঘাত পেয়েছিলেন। ঘটনাটি ছোট, মনে না রাখার মত কেউ বলতে পারেন। কিন্তু এর শিকড় বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ভারতে মানুষের পরিচয় তার ভাষা নয়। জাতি নয়-ধর্ম। বার বার রাজনীতিতে তা এসেছে।

ভাষার বন্ধন যেখানে ভৌগলিক সীমান্ত মধ্যে আবদ্ধ থাকে, সেখানে জাতিগত সচেতনতা প্রবল। বাংলাদেশে (অবিভক্ত) এজন্য বাঙ্গালী জাতীয় চেতনা বার বার সামনে এসেছে। সাম্প্রদায়িক পরিচয় কিংবা রাজনীতিতে সাম্পদায়িকতা তাকে বিকাশ ও চেতনার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু চরম বিপদের দিনে সেই সত্তা সামনে চলে এসেছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ব্যাপকভাবে মুসলিমদের বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এনেছে নানা কূটকৌশল, তাতে সাহায্য করেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। বঙ্গভঙ্গের সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, একজাতি এই চেতনা যাদের মধ্যে কাজ করেছিল রবীন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রাখী বন্ধন কর্মসূচীতে অংশ নেন। মিছিল করে যাওয়ার সময় তিনি স্থির করলেন মুসলিমদের হাতে রাখী বেঁধে দিবেন। অন্যেরা বিস্মিত হলেন। কারণ এরকম চিন্তাও তাদের ছিল না। প্রয়োজনটা কোথায় সে চেতনাও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে গেলেন কলুটোলা মসজিদে গিয়ে মুসলিমদের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। ফিরে এলে তাকে প্রশ্ন করা হল, মুসলিমরা কী বলল। তিনি বললেন, রাখী বেঁধে দেয়ায় তারা একটু হেসেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম দিকে তিনি রাজনীতিতে কিছুটা সক্রিয় অংশ নিলেও সরে আসেন। কারণ হল হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাব জাতীয়তাকে গ্রস্ত করার ব্যাপারটা তার কাছে ভাল ঠেকেনি। এজন্যই হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রসঙ্গে তিনি একস্থানে এর ফাঁকির দিকটার সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, মুসলিমদের যখন কাছে ডেকেছি ভাই বলে ডাকিনি, প্রয়োজনের জন্য আহবান জানিয়েছি। প্রয়োজনের সঙ্গে আন্তরিকতার পার্থক্য কোথায় কবির দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে অনৈক্যের কারণটার গোঁড়ায় তিনিপৌঁছেছিলেন।

ঠিক একই মানসিকতা মুসলিম সম্প্রদায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা গেল। ইংরেজদের বিশ্বস্ত হওয়ার তাগিদে প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরুদ্ধে স্যার সৈয়দ আহমদের বিষোদগার লক্ষণীয়। এতে অংশ গ্রহণকারী হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোককে তিনি অশ্রদ্ধার সঙ্গে সমালোচনা করেছেন। তা ছাড়া তার প্রথম দিকের উদার মনোভাব পরবর্তী সময়ে ছিল না। ক্রমেই তিনি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে সংকীর্ণতার পরিচয় দেন। ভারতের ইতিহাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের জাগরণে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যার অবদান অসামান্য তার এই সীমাবদ্ধতা ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস কম প্রভাবিত করেনি।

রাজনীতিতে মোটা দাগে দেখতে গেলে কংগ্রেসে জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতার সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং তাই নিয়ে বৃটিশ শাসনের বিরোধিতায় সে এগিয়ে গেছে। অপর দিকে মুসলিম লীগ বৃটিশ বিরোধিতা পরিহার করে সম্প্রদায়গত পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে গিয়ে শুধু সাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দিয়েছে। সুতরাং সাধারণভাবে অসতর্ক মুহূর্তে যেখানে ভাষার বন্ধন নিবিড় নয়, সেখানে ভারতীয় জাতিসমূহ একদিকে আর ভারতীয় মুসলমান প্রদেশ ও জাতীয়তা নির্বিশেষে শুধু মুসলমান। তার চেয়েঅতিরিক্ত নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথমদিকে কবি সমর সেন দিল্লীর একটি কমার্শিয়াল কলেজে অধ্যাপনার চাকরি নেন। তখন বুদ্ধদেব বসুকে এক চিঠিতে কলেজের ছাত্রদের সম্পর্কে লেখেন, "ছেলের মধ্যে বাঙ্গালী, শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান মাড়োয়ারী, মারাঠী, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আছে। লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি শিখদের কথা বলেছেন, ধর্মীয় পরিচয়ে এবং জাতিতে তারা পাঞ্জাবী। আবার পাঞ্জাবী মুসলিম আলাদা করে বলেছেন। পাঞ্জাবের নিজস্ব গুরুমুখী ভাষার চর্চা পাঞ্জাবীরা করলেও তার সাহিত্য সমৃদ্ধ করার দিকে কোন পাঞ্জাবী বুদ্ধিজীবী নজর দিতেন না। একটু খ্যাতনামা হলে তারা উর্দূ বা হিন্দীতে লিখতেন। ফলে সমর সেনকে ছাত্রদের পরিচয় হিসাবে শিখ ও পাঞ্জাবী মুসলমান উল্লেখ করতে হয়েছে। বাঙ্গালীদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটেনি। ভাষা ও সংস্কৃতিই একটি জাতির পরিচয় এবং জাতিগত চেতনা কত গভীর করে।

আর এই চেতনার ব্যাপ্তি ও গভীরতাই বাংলাদেশ সার্থক করে তুলেছে তার গত কয়েক দশকের সাধনায়। দেশ ভাগের পর এই অংশের বাঙ্গালীদের আত্মজাগরণের তূর্যনিনাদ শোনা গেল ভাষা আন্দোলনে। তাই নিয়ে এল তাঁর শতাব্দী লালিত স্বপ্নকে সাফল্যের মনিকোঠায়- স্বাধীন বাংলাদেশ। তারপর কত চক্রান্ত আর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের দরবারে দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এই চেতনাকে ধ্বংস করতে পারেনি। আঘাত আসছে বার বার। তাদের লক্ষ্য আমাদের শিক্ষাঙ্গন। এখান থেকেই মুক্তির বাণী ছড়িয়েছিল। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী শিক্ষাঙ্গনকে তাই বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল প্রথম আঘাতে। আবার নতুন করে সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলছে একশ্রেণীর মৌলবাদী। তারা মুক্ত বুদ্ধির বধ্যভূমিতে পরিণত করতে চায় শিক্ষাঙ্গনকে। আজকের ছাত্র সমাজকে তাই আরও সতর্ক হতে হবে। আরও সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। ওরা আমাদের শিক্ষার শিকড় উপড়ে ফেলতে চায়।